চিরকালের গল্পগাথা

লীলা মজুমদার

পুনশ্চ

সূচিপত্র

আমার ছেলেবেলা ৯

ছড়া ও কবিতা

কবিতা ১৫

উপন্যাস

পদিপিসীর বর্মিবাক্স ২১
হলদে পাখির পালক ৩৪
বকধার্মিক ৬৩
গুপীর গুপ্তখাতা ৯৭
টংলিং ১২৯
সেজমামার চন্দ্রযাত্রা ১৬৩
ভূতোর ডাইরি ১৭০

নাটক

বক-বধ পালা ২০১
লঙ্কাদহন পালা ২১৮
বালী সুগ্রীব কথন ২৩৫

গল্প

গণ্‌শার চিঠি ২৪৭
দিন দুপুরে ২৫০
নতুন ছেলে নটবর ২৫৩
বদ্যিনাথের বড়ি ২৫৬
ঘোতন কোথায় ২৫৯
সর্বনেশে মাদুলি ২৬৩
বাঘের চোখ ২৬৬
বহুরূপী ২৭০
ভানুমতীর খেল ২৭৩
সেকালে ২৭৬
দিনের শেষে ২৭৯
পালোয়ান ২৮৩

পেনেটিতে ২৮৬
আহিরিটোলার বাড়ি ২৮৯
খাগায় নমঃ ২৯২
পিলখানা ২৯৬
ভুতুড়ে গল্প ৩০০
যুগান্তর ৩০৪
দামুকাকার বিপত্তি ৩০৭
কর্তাদাদার কেরদানি ৩১০
যাত্রামঙ্গল ৩১৫
খোকাবাবু ৩১৭
হাতি চড়া ৩১৯
খিদে ৩২২
সুখীদের বন ৩২৫
চা বাগানের হাতি ৩২৮
আষাঢ়ে গল্প ৩৩০
আজগুবি নয় ৩৩৩
বড়ো জ্যাঠামশায়ের গল্প ৩৩৬

খেরোর খাতা

ভ্—ভূত্! ৩৪১
শান্তিনিকেতন ১৯৩১ ..... ৩৪৩
ডাক্তার ৩৪৬
ছেলে মানুষ কর ৩৪৮
গিরীশদা ৩৫১
চোর ৩৫৩
মাছ-ধরা ৩৫৫
কুকুর ৩৫৮
বিচিত্র গল্প ৩৬০
বাঘ ও বিজয়মেসো ৩৬২
রেলগাড়িতে ৩৬৪
দিলীপ ৩৬৬
মেয়েদের কথা ৩৬৯
লেখকদের খোশ-গল্প ৩৭১

নানা নিবন্ধ

শান্তিনিকেতন ৩৭৫
মর্মর প্রাসাদ ৩৭৭
আজকাল ৩৭৯
বাতিঘর ৩৮০

আমার ছেলেবেলা

আমি জন্মেছিলাম ২৬এ ফেব্রুয়ারি, ১৯০৮ সালে, আমার জ্যাঠামশাই উপেন্দ্রকিশোরের বাড়িতে—উত্তর কলকাতার ২২ নং সুকিয়া স্ট্রিটের সেই বিখ্যাত ভাড়া বাড়িতে, যার কথা আমি বহুবার লিখেছি।

থাকিনি সেখানে। বাবা সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার কৃতী অফিসার; তাঁর কর্মক্ষেত্র সারা ভারত জুড়ে ক্রিকেট খেলতেন; ঘোড়ায় চড়তেন; ঠেকায় পড়লে বাঘ-ও মারতেন, যদিও নিরামিষ খেতেন। যেমনি রাগী, তেমনি দয়ালু। সেকালের কড়া বাপদের মতো তিনিও বিশ্বাস করতেন ছোটোদের হেন বেআদবি বা পেজোমি নেই, যা এক চড়ে সারে না!!

আমার দু-বছর বয়সে বাবা ব্যাঙ্গালোর থেকে খাসিয়া পাহাড়ের প্রধান শহর শিলং-এ বদলি হলেন। সেখানেই আমার বারো বছর বয়স অবধি কাটে। এখনো মনে হয় স্বর্গের সঙ্গে ও জায়গার কোনো তফাত ছিল না।

বাড়ির পিছনে কুলকুল করে বয়ে যায় পাহাড়ে নদী। হেঁটে পার হয়ে ওপারের সংরক্ষিত বনে বেড়াতে যাই আমরা; কোনো বুনো জানোয়ার আছে বলে মনে হত না। বনের পাখি গান গাইত। রাতে হুতুম প্যাঁচা ডাকত। খ্যাঁকশেয়াল ডাকত।

বাড়ির পিছনে পাহাড়; তার পিছনে আরো উঁচু পাহাড়; তার পিছনে আরো। পরিষ্কার দিনে মনে হত আকাশে আঁকা সাদা সোনালি বরফের পাহাড়। বলিনি স্বর্গের সমান। বর্ষাকালে ওই নদীই ফুলে ফেঁপে গর্জন করে ছুটে যেত। যা কিছু, যে কেউ পথে পড়ত, তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেত। আবার ঘন্টা দুই না যেতে যে কে সেই, টলটলে নদী হেসেখেলে ছুটে চলেছে!

তখনো শিলং-এ একটা ফিরিঙ্গি সরকারি স্কুল আর লোরেটো কনভেন্ট ছাড়া ভালো স্কুল ছিল না। দিদি আর আমি কনভেন্টে পড়তাম। ৬/৭ বছর সেখানে পড়ে, ইংরিজি ভাষায় আর সেলাই-ফোঁড়াই, ছবি-আঁকায় দক্ষ হয়ে উঠেছিলাম। ফরাসি ভাষা ভালো করে শেখানো হত। কোনো দিশি ভাষা বা ইতিহাসের নামগন্ধ ছিল না। বাড়িতে বাংলা পড়তাম। জ্যাঠামশাইরা সেকালের সব ছোটোদের বই পাঠিয়ে দিতেন। এখনো আমার মনে হয় যে আজ পর্যন্ত কোনো ছোটোদের বই রসে কিংবা ভাষার মাধুর্যে সে সব বইকে অতিক্রম করে যায়নি।

আরো মনে হয় পৃথিবীর সব দেশের সব ভালো ছোটোদের বই, সব ভাষায় অনুবাদ করা উচিত। তারা মানবতার মূলে পৌঁছে যায়; দেশ কাল পাত্র ভেদ থাকে না। উপেন্দ্রকিশোরের ছড়া ও রম্যরচনাগুলি মৌলিক হলেও, গল্পগুলি প্রাচীন লোককথা বা পুরাণ থেকে সংকলন করা। সব দেশের, সব কালের সম্পত্তি। একদিকে আরব্য উপন্যাসও তাই; নাবিকদের মুখে মুখে পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়া; সম্ভবত মধ্য ইউরো-এশিয়াতে তাদের জন্ম। সুখলতা রাওয়ের পরীদের গল্পগুলির ইউরোপে জন্ম, কিন্তু ভাবে সব দেশীয়।

বন্ধুবান্ধবের কথাই যদি ধরা যায়, লোরেটোতে সাত বছরেরো বেশি পড়াশুনো করেছিলাম, কিন্তু একজনও অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়নি। শিক্ষিকাদের মধ্যে নান্‌রা খুবই ভালো ব্যবহার করতেন, কিন্তু ফিরিঙ্গি মেমরা আর ছাত্রীরা 'নেটিভ' বলে আমাদের ঘৃণা করত। অনেকে আবার আমাদের চেয়েও কালো! তারাও বলত ওদের বাড়ি নাকি স্কটল্যান্ডে কিম্বা আয়ারল্যান্ডে এবং ২/১ বছরের মধ্যেই সেখানে চলে যাবে! দু-চারজন খাঁটি বিলিতি অফিসারদের ছেলেমেয়েরা ভালো ব্যবহার করত। প্রায় প্রত্যেক ক্লাসেই যে দু-চারজন করে দিশি মেয়ে পড়ত, সাধারণত তারাই প্রথম কি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করত। এমনি করে উল্টো প্রতিক্রিয়া মনের মধ্যে গড়ে উঠেছিল। আমরা স্বদেশ এবং কালো মানুষদের ভালোবাসতে শিখেছিলাম।

আমার যখন ১২ বছর বয়স, বাবা কলকাতায় বদলি হলেন, আমরা ডায়োসেস স্কুলে ভর্তি হলাম। দু মাস লাগল হালচাল শিখে নিতে। তারপর থেকে আমার গোটা ছাত্র জীবনকে একটা আনন্দযজ্ঞ বলা যায়।

বন্ধুবান্ধব যাদের পেয়েছি, তাদের স্মৃতি মনের মধ্যে একটা স্নিগ্ধ কোমল জায়গা জুড়ে আছে। শিলং-এও আমাদের বন্ধুবান্ধব ছিল। তারা হিন্দু, না মুসলমান, না ব্রাহ্ম, না খ্রিশ্চান, তার খবর রাখতাম না। এ-বাড়ি ও-বাড়ি যাওয়া, একসঙ্গে চড়িভাতি করা সারা বছর লেগেই থাকত। আমাদের কাছে কাঞ্জিলাল জ্যাঠামশাইয়ের নাতিরা, আমজাদিয়া জ্যাঠামশাইয়ের বাড়ির সবাই; মজিদ সাহেবের ছেলেমেয়েরা; বাবার অফিসের প্রফুল্ল কাকাবাবুর বাড়ির নাড়ু নীলু ঋষি বেবি ইত্যাদি; অমর কাকার বাড়ির হরিচরণ নন্দ নীরু ইত্যাদি রক্ত সম্পর্কের চাইতে কম নয়।

এখানে একটা মজার কথা না বলে পারছি না। ওই স্কুলে চেনা কালো মেমসায়েবদের কেউ কেউ, পরে আমার জীবনে আবার দর্শন দিয়েছিল, শাড়ি পরা বাঙালি-খ্রিশ্চান রূপে। তখন দেখলাম মুখ দিয়ে দিব্যি বাংলা কথা ফুটছে! এ দুনিয়াতে যে কত সঙের খেল দেখলাম, তার গোনাগুন্তি নেই।

বাড়িতে মা, বাবা-তিনিও ৬ মাস করে বনে বনে সফর করতেন—আমরা ৮ ভাইবোন, কলকাতা থেকে ছুটি ছাটায় আগত মাসতুতো, পিসতুতো, জ্যাঠতুতো ভাইবোন কত যে আসতেন তার ইয়ত্তা নেই। সুকুমার, সুবিমল, প্রশান্ত মহলানবিশ ইত্যাদি অনেককে কাছে পেয়েছিলাম। তবে বয়সে সবাই অনেক বড়ো।

কলকাতায় একবারই এসেছিলাম, আমার ৫ বছর বয়সে। মায়ের অ্যাপেন্ডিসাইটিসের চিকিৎসার জন্য। এখানে বলি হোমিওপ্যাথি করে ডঃ ইউনান মাকে সারিয়ে দিয়েছিলেন।

থাকতাম একটা ভূস্বর্গে আর কলকাতার স্বপ্ন দেখতাম। ৫ বছর বয়সে ওই একবার দেখা কলকাতা মনের মধ্যে ঝলমল করত। চিড়িয়াখানা, সার্কাস, নিউ মার্কেট—এসব কি সহজে ভোলা যায়? আসল কলকাতা দেখিনি কখনো।

নতুনের নেশায় ভরপুর হয়ে ১৯১৯ সালে শিলং ছেড়ে চলে এসেছিলাম।

সেই আমার ছোটো বেলার কলকাতা, সে আজও আমার মনের মধ্যিখানে গাঁথা আছে। সেটা ছিল ১৯১৯ সালের ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহ। আমার সুরসিক ছোটো জ্যাঠা, কুলদারঞ্জন আমাদের ৬ ভাইবোনকে ফিটন গাড়িতে চাপিয়ে রাজার হালে সায়েবদের বড়ো দিনের নিউমার্কেট দেখিয়ে আনলেন! আমরা তাজ্জব বনে গেলাম। সে কি আলোর বাহার! সে কি বাদ্যি-বাজনা! দোকানে দোকানে সে কি সাজের ঘটা! শান্ত সুন্দর পাহাড়ের রানি শিলং শহর থেকে নেমে এসেই, সে-সব দেখে আমরা তাজ্জব বনে গেলাম!

তার ওপর জ্যাঠামশাই কত খেলনা কিনে দিলেন; হাত ভরে কেক চকোলেট দিলেন। আইস্-ক্রিম বলে এক আশ্চর্য জিনিস খাওয়ালেন। জীবনে কখনো এমন জিনিস দেখিনি।

শীত? একে নাকি শীতকাল বলে। শিলং-এ হলে আমরা বলতাম গ্রীষ্মকাল। বলা বাহুল্য গাছপালা কেটে ফেলাতে, সেখানেও আজকাল নাকি তত শীত পড়ে না; বালটির জল বাইরে রাখলে ওপরে একটা পুরু চাকা জমে যায় না! হায়রে কলিকাল!

তারপর ভরা মনে, ভরা পেটে, কোল-ভরা আজব উপহার নিয়ে, ফিটন গাড়ি চেপে বাড়ি ফেরা! চোখ তখন ঘুমে ঢুলে আসছে! পার্থিব সুখ যখন খুব বেশি হয়, তখন তাতে স্বর্গের রঙ লেগে যায়।

২২নং সুকিয়া স্ট্রিটে মেজজ্যাঠা উপেন্দ্রকিশোরের বাড়ির ছবিটিও যেন চোখের সামনে দেখতে পাই। সামনে এক ফালি রোয়াক; এক পাশে ভেতর বাড়ি যাবার গলি; অন্য পাশে সরকারি গলি। একতলায় প্রেস্, ছাপাখানার আপিস ইত্যাদি। সব আমাদের কাছে প্রবেশ নিষেধ। তাতে কি? দোতলার সামনের দিকে বসবার ঘর; তার বাইরে খোলা বারান্দা থেকে পথ দিয়ে গাড়ি-ঘোড়া যেতে দেখা যায়।

কি বই পড়তে ভালোবাসতাম ছোটোবেলায়? যে বই হাতে পেতাম নিশ্বাস বন্ধ করে পড়ে ফেলতাম। কতক বুঝতাম, কতক বুঝতাম না। না-বোঝা অংশটুকুরো মনে মনে একটা মানে ঠাউরে নিয়ে ভারী উপভোগ করতাম।

আগেও বলেছি জ্যাঠামশাইরা কলকাতা থেকে ছোটোদের যত বই বেরুত সব পাঠিয়ে দিতেন আর আমরা নির্বিচারে সেগুলো গিলতাম। বিশ্বাস কর আর নাই কর, অত বড়ো লোরেটো কনভেন্ট। সেখানে চ্যাপেল বা উপাসনা-ঘর থাকলেও, ছোটোদের কিংবা বড়োদের কোনো পুস্তক-সংগ্রহ ছিল না। তবে নীচের ক্লাসের পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে স্কুল থেকেই দেওয়া হত; যত্ন করে রাখতে হত; বছরের শেষে ফেরত দিতে হত।

স্কুলে পুস্তকালয় না থাকলেও, আমাদের স্কুলে পড়ত আনন্দ মোহন বসুদের বাড়ির সরোজ বোসের মেয়েরা। ওদের চমৎকার ইংরিজি বইয়ের সংগ্রহ ছিল। তার অধিকাংশই বিখ্যাত লেখকদের রচিত পরীদের গল্প। কল্পনার ঘোড়াকে দম দেবার জন্য তার জুড়ি নেই।

মা-র কয়েকটা সযত্নে রাখা রবীন্দ্রনাথের কবিতার ও গল্পের বই ছিল। তার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতাম না। পড়ে শোনালেও কেষ্টা বেটাই চোরের কবিতা ছাড়া একটাও পছন্দ হত না। এমনিভাবে আমার গোটা ছেলেবেলাটা কেটেছিল। এখনো ভাবি রবীন্দ্রনাথের ছোটোদের বিষয়ে গল্প কবিতার তুলনা হয় না; কিন্তু তাদের জন্যে যেগুলো লেখা সেগুলোকে বুঝিয়ে না দিলে সাধারণ ঘরের ছোটোদের বোঝা দায়। যদি না ঠাকুরবাড়ির, কি শান্তিনিকেতনের সঙ্গে অন্য যোগসূত্র থাকে।

ছোটোবেলাকার সব ঘটনাই উল্লেখযোগ্য। বাবার সঙ্গে শিলং-এর সংরক্ষিত বনে গিয়ে দেখেছিলাম মাটি থেকে বুগ বুগ করে জল বেরুচ্ছে। চারদিকের পাহাড়ের গা সবুজ শ্যামল। সে দৃশ্য এখনো আমার চোখে লেগে আছে। উৎসের মুখে সরকার কাচের দেয়াল দেওয়া ঘর করে, সেখান থেকেই পাইপে করে আরেকটু নীচে বিশাল ট্যাঙ্কে জমা করার ব্যবস্থা করেছিলেন। ট্যাঙ্ক থেকে পাড়ায় পাড়ায়, ঘরে ঘরে জল সরবরাহ হত। আমি বলছি ১৯১৩/১৪ সালের কথা। প্রথম মহাযুদ্ধ চলেছে তখন। মনে হয়েছিল মানুষ মানুষকে গুলি করে মারে। কিন্তু প্রকৃতি মিষ্টি জল দিয়ে প্রাণীদের বাঁচায়।

এ কথা বলতে আরেকটা ঘটনাও মনে পড়ে গেল। তখন শীতকাল। অধিকাংশ ছোটো জানোয়ার কোটরে-ফোকরে শীতের ঘুম দিচ্ছে। আমরা বেড়াতে বেরিয়েছি। শর্ট-কাট করবার জন্য সড়ক ছেড়ে নিচু জায়গায় নেমেছি। আগের রাতে শীতের এক পশলা বৃষ্টি পড়েছিল। দেখি পাহাড়ের গায়ে খুদে ধস নেমেছে। একটা পাথুরে কোটরের মুখের পাথরটা খসে পড়ে গেছে। ভিতরে একটা এক হাত লম্বা সবুজ সাপ নীল চোখ মেলে অসাড় হয়ে শুয়ে আছে।

আমরা ভাবলাম মরে গেছে। আমাদের কাজের লোক পন্নু বলল, 'মরেনি। সারা শীত ওরা কোটরে গা ঢাকা দিয়ে ঘুমোয়। চোখের পলক নেই ওদের, তাই মনে হয় চেয়ে আছে। এ সাপ খুব বিষধর।'

আমরা বললাম, 'ওকে মেরে ফেলবে না?' পন্নু যত্ন করে খসা পাথরটা যথাস্থানে বসিয়ে বলল, 'ঘুম দিয়ে পৃথিবী মা ওদের বাঁচান। ঘুমন্ত শত্রুকে মারলে পাপ হয়, তাও জান না?'

সন্দেশ পত্রিকার প্রথম বছরের প্রথম সংখ্যাটি হাতে নিয়ে মেজ জ্যাঠামশাই উপেন্দ্রকিশোর এক সন্ধেবেলায় হাসি মুখে, ২২নং সুকিয়া স্ট্রিটের দোতলার বসবার ঘরে উঠে এলেন। সেদিনের কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। ১৯১৩ সাল। বড়দা সুকুমার বিলেতে। ছোটো জ্যাঠা কুলদারঞ্জন আর সম্ভবত সদ্য বি-এ পড়া সুবিনয়কে হামেশাই দেখতাম লম্বা লম্বা ছাপা-কাগজে কলম দিয়ে দাগ কাটেন। কাছে গেলে বিরক্ত হন; বলেন 'প্রুফ দেখছি, বিরক্ত কর না।'

সেই সন্ধ্যায় বসবার ঘরে মা, সুখলতাদি, পুণ্যলতাদি, টুনিদি সবাই ছিলেন। জ্যাঠামশাইয়ের হাতে রঙিন মলাট দেওয়া একটা পাতলা বই। তাই দেখে সকলে আনন্দ কোলাহল করে উঠলেন। কে যেন বুঝিয়ে দিল ছোটোদের জন্য প্রতি মাসে ওই রকম রঙিন মলাট দেওয়া, গল্পে কবিতায় আর নানা ছবিতে ভরা একটা করে বই বেরুবে। আমি সবে অক্ষর চিনতে শিখেছি; আঙুল দেখিয়ে দেখিয়ে অজ, আম পড়ি। এ-বি-সি-ডি চিনি। কিন্তু সেদিন যখন টুনিদি সন্দেশ থেকে ছড়া পড়ে শোনালেন, মনে হল এ আমি কোন নতুন রাজ্যে চলে গেলাম। হয়তো সেদিন থেকেই আমার ভবিষ্যতের খাতায় টিপসই পড়ে গেছিল। আমি বড়ো হয়ে ছোটোদের জন্য লিখব; এ ছাড়া অন্য কিছু আমি ভাবতেই পারিনি।

সন্দেশে আমার প্রথম গল্প বেরোয় আমার তেরো-চোদ্দো বছর বয়সে। গল্পের নাম 'লক্ষ্মী ছেলে'। একটা দুষ্টু ছেলে কী করে ভালোমানুষ মামাকে ঠকিয়ে নিজের সুবিধে করে নিয়েছিল, সেই গল্প। আমি হলে ছাপতাম না। অন্যায় কাজ করে নিজের সুবিধা করছে কেউ, এ গল্পকে আমি ভালো বলি না। যদিও বড়দা ছেপেছিলেন। আর কখনো এমন কাজ করিনি আর নিজেদের সম্পাদনাকালে অমন গল্প এলেই, বাতিল করে দিই। যদি না বদলে দেয়।

বড়দা যখন চোখ বুজলেন আমার বয়স ১৫। ২/৩ বছর বাদে নতুন মালিকানায় এবং সুবিনয়ের সম্পাদনায় সন্দেশ আরো কয়েক বছর চলেছিল এবং প্রায় প্রত্যেক সংখ্যায় আমার একটি করে ছোটোগল্প বেরুত। আমি এম-এ পাস করে শান্তিনিকেতন গেলে, কবির কথায় বুঝেছিলাম উনি সন্দেশ পড়েন আর আমার গল্প উপভোগ করেন। বলেছিলেন, 'বই করে ফেল, নইলে গল্প হারিয়ে যায়।' কিন্তু তখন আর কে আমার বই ছাপবে?

পরে যখন রামধনুর মালিক আমার বন্ধু ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ 'বদ্যিনাথের বড়ি' নাম দিয়ে ছাপলেন, কবি তখন এত অসুস্থ যে ভূমিকাও লিখে দিতে পারলেন না। আমার সে দুঃখ মেটাই আমি অজ্ঞাত গুণী লেখকদের নতুন বইয়ের ভূমিকা লিখে।

মনে মনে অমন দুটি গুরু পেয়েছিলাম বলে নিজেকে আমি ধন্য মনে করি। এমন মারস, এমন সরল, এমন সৎ সাহসী কম দেখা যায়। দুঃখের বিষয় রবীন্দ্রনাথের গভীর ভাষায় লেখা অনেক প্রবন্ধ সকলে বুঝে ওঠে না।

লেখাপড়া, স্কুলের কথা গল্পচ্ছলে যথেষ্ট বলা হয়েছে। বাকি থাকে ছবি আঁকার কথা। আঁকতাম বই কি। স্বদেশি মেলার প্রদর্শনীতে রূপোর মেডেল-ও পেয়েছি। 'বদ্যিনাথের বড়ি'র মলাটের অপূর্ব ছবিটি তখন পর্যন্ত অজ্ঞাতকুলশীল শৈল চক্রবর্তীর আঁকা, কিন্তু ভিতরের স্কেচগুলি আমার। তারপর দুঃখের কথা আর কি বলব, আমার ভাইপো সত্যজিৎ এত বেশি ভালো ছবি আঁকতে শুরু করে দিল যে আমি ছবি আঁকা ছেড়েই দিলাম এবং আমার মতে তাতে দেশের ও দশের কোনো ক্ষতি হয়নি।

ইতি
তোমাদের লীলাদি

পক্ষিরাজ

পক্ষিরাজ ঘোড়া যখন মাটির পরে রয়,
ছ্যাকড়া গাড়ির খেমো ঘোড়া দেখলে মালুম হয়।
ঐ ঘোড়া যেই পাখনা মেলে অন্তরীক্ষ রয়,
তেজ দেখে আর রূপ দেখে সব বলে জয় জয়।

তেমনি মোদের কাগজখানি দেখতে কিছু নয়;
মেললে পাখা যায় না ঢাকা আসল পরিচয়।
এই কথাটি আমার পরাণ ঘোড়ার কানে কয়,
পাখ মেলে ডাক ছাড় দেখি ভাই, হবেই প্রত্যয়।

খবরালোক

দেখেছি ভূধর, বন-বনান্তর,
আকাশের তলে ফেনিল সাগর।
দেখেছি শ্বাপদ দাঁতাল ভয়ঙ্কর,
ফুল ফল পাখি অপূর্ব সুন্দর;
দেখেছি বিস্ময়ে অভাবনীয় অদ্ভুত,
কিন্তু কখনো দেখিনি কো ভূত!

দিতে চাই

কত কথা মনে ছিল, দিতে পারি নাই;
আসল রতন তলায় ছিল বাদ পড়েছে ভাই।
কত ছবি কত সুর থলিতে জমাই;
থলির নীচে ফুঁটো ছিল, শূন্যে পুঁজি তাই।
কি যে ভালো, কি যে নয়, তাও বুঝিনি ছাই;
যাবার আগে শূন্য হাতে নিজেরে বিলাই!

খুদে পাখি

খুদে পাখি মাথায় তুলি,
উড়িয়ে দিলাম আকাশ পথে।
অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখি,
যাচ্ছে চড়ে সোনার রথে,
মাঝগগনের সূর্য পানে,
ভরিয়ে ধরা গন্ধে গানে।

স্বপ্নের কলকাতা

ধূলো কাদা ধোঁয়া মাখা কলকাতা,
তারি মাঝে আমাদের ঘরগুলি পাতা।
মাছি ওড়ে, কয়লা পোড়ে, ডাকে পাখি,
ডানা মেলে দেয় চিল, মোরা সুখে থাকি।
পায়রা উলটি খায় কার্নিশের গায়,
মৌটুসি গলির কোণে, বাসা বোনে।
ফিঙে নাচে, কামিনী ফোটে ঐ কোণে।
রামমোহন, ঈশ্বর, বিবেকানন্দ, রবি
অদেখা হরপে হেথা এঁকেছিল ছবি।
কত গুরু, গাইয়ে, নট, শহিদ, শিল্পী, কবি
অলিতে গলিতে একদা হেঁটেছিল সব-ই।
গড়েনি প্রাসাদ, চড়েনি হাতি, পরেনি রেশমি সাজ
লিখেছে কাব্য, গেয়েছে গান, এঁকেছে ছবি, করেছে কাজ।
কোথা গেল আজ মোর স্বপ্নের সেই কলকাতা,
বাংলার মান যেথা একদিন তুলেছিল মাথা।

কলকাতা

গঙ্গার তীরে ছিল গাঁও গঞ্জ হাট;
ডাকাতের ভয় ছিল, ছিল কালীঘাট।
গোলপাতার ঘর ছিল, তালপাতার ছাতা;
ঘন বনে বাঘ ছিল, পড়েছি সে গাথা।
ছিল না কো শহর, তবু ছিল কলকাতা,
বিধাতার মনের মাঝে অলঘ ছকে পাতা।
সুদূর বিদেশবাসী রূপ দিল তার।
জব চার্নকের পদে করি নমস্কার।